উপসংহার

হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সময়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময় যেমন বিবর্তনশীল তেমনি সময়ের বিবর্তনে হাস্যরসের ধ্যানধারণায় আসে পরিবর্তন। পাল্টে যায় হাস্যরসের বিষয়বস্তু। পরিবর্তিত হয় তাঁর প্রকৃতি। তাই সুফট বা ভলতেয়ার যে বিষয়গুলিকে নিয়ে একসময় হাস্যরস জমিয়ে তুলেছিলেন বর্তমানে সে বিষয়গুলি অনেকটাই তিরোহিত। সে বিষয়গুলির তিরোধানে তাঁদের রচনাগুলিরও যে একটি বড় ভূমিকা ছিল সমাজতাত্ত্বিকেরাও সে কথা স্বীকার করেন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জীবনযাত্রা, জীবনধর্মে বিচ্যুতি এবং অসঙ্গতির মাত্রা ও প্রকৃতি একেক যুগে একেক রকম হয়। তার পরিণামও হয় ভিন্নমুখী। তাই হাস্যরসিককেও তার স্বভাব বদল করতে হয়। কৌশলে আনতে হয় পরিবর্তন। স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত দুজন হাস্যরসিকের দৃষ্টিভঙ্গীও হয় ভিন্ন। বলা ভালো সমাসাময়িক যুগ তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। মনে রাখতে হবে যে, হাসি সৃষ্টি করাই হাস্যরসিক সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। হাসির মধ্য দিয়ে হাস্যরসিক জীবনকে দেখাতে চান, সমাজ জীবনের নির্মমতাকে তুলে ধরতে চান। হাস্যরসিক হিসেবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ও এ বাস্তব সত্যকে ভুলে যাননি—উপরোক্ত আলোচনার শেষে এমন একটি সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই আসা যেতে পারে।

সাধারণ হাসি আর সাহিত্যিক হাস্যরস সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকলে সাহিত্যে হাস্যরসের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব হয় না। ভূমিকা অংশে হাস্য রসের সংজ্ঞা দানের পাশাপাশি হাস্যরসের যে বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্য রয়েছে তারও সুলুক সন্ধান করা হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে হাস্যরস তা যেমনই হোক না কেন তার মূল কারণ কিন্তু অসঙ্গতি। সমাজ-সংসারের অসঙ্গতি দেখেই তো হাস্যরসিকেরা তাদের কলম ধরেন। কৌতুকের আবহে জীবনের নানা অসঙ্গতিগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন তারা। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন গল্পকারই হাস্যরসের এই মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেই বোধ থেকেই তাঁরা তাঁদের লেখনিকে চালিত করেছেন।

অধ্যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণাপত্রের প্রথমেই **'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা'** শিরোনামাঙ্কিত অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাসি ভাঁড়ামির পর্যায় অতিক্রম

করে আধুনিক যুগে হাস্যরসের পর্যায়ে উন্নীত হল এবং এই উন্নীত হওয়ার পেছনে সমসাময়িক যুগও যে অনেকটা দায়ী সেই সত্যও এখান থেকে উঠে এসেছে। কেননা সমাজ জীবনের অসঙ্গতিকে সাহিত্যে তুলে ধরার জন্য যে পরিমান ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন মধ্যযুগে সে ধরনের ব্যক্তিত্ববোধ সম্পন্ন লেখক ছিলেন না। আধুনিক যুগে ইউরোপীয় প্রভাবে যখন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ ঘটলো তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও এল পরিবর্তন। সমাজ জীবনের নানা অবস্থা যেগুলি তাদের চোখে অস্বস্তিকর ঠেকল সেগুলিকেই তারা কৌতুকের আবহে তির্যকভাবে তুলে ধরতে চাইলেন। এরফলেই সূচনা হল ব্যঙ্গ সাহিত্যের যার প্রথম পুরোহিত ছিলেন নিঃসন্দেহে ঈশ্বর গুপ্ত। এরপর সময়ের বিবর্তনে সমাজ জীবন যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি পরিবর্তিত হয়েছে লেখক ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা। এই ধারাতেই বাংলা সাহিত্যে এসেছেন বাংলা হাস্যরসের শিল্পীত্রয়ী—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। এভাবে বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের প্রায় সামগ্রিক পটভূমিকায় এই হাস্যরসিকত্রয়ীর যথার্থ অবস্থান নির্ণয় করাই ছিল এই অধ্যায়ের কাঙ্ক্ষিত।

বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পে প্রথম স্মরণীয় নাম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছিলেন যতটা না সাহিত্য রচনার জন্য তার থেকে অনেক বেশি সমাজ ও জাতির প্রগতির স্বার্থে। তাঁর রচনায় বিশেষভাবে প্রবন্ধগুলিতে রয়েছে সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ভাষণ। মনে রাখতে হবে ত্রৈলোক্যনাথ যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন সে জীবন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের। ইতিমধ্যেই ঔপনিবেশিকতা বাঙ্গালী জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। কিন্তু দৃঢ়ভাবে বাঙ্গালী জীবনে সে ঔপনিবেশিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। ফলতঃ ঔপনিবেশিকতাকে গ্রহণ করার প্রশ্নে প্রবল দ্বন্দ্বে আলোড়িত হয়েছিল এ দেশীয় সমাজ। কতিপয় বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক শিক্ষার দোসর হলেও বেশিরভাগ বাঙ্গালীই মেতেছিল প্রাচীন কুপ্রথাকে নিয়ে। ব্রাহ্মণ নির্দেশিত হিন্দু সমাজ এবং এই সমাজের নানা কুপ্রথা কীভাবে এই দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল তা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন ত্রৈলোক্যনাথ। গভীর জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন ত্রৈলোক্যনাথ বাঙ্গালীর এ জীবনকেই তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে রঙ্গকৌতুকের আবহে, তার সঙ্গে অশ্রুর আভাস মিশিয়ে। তাই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের বিষয় তাঁর চোখে দেখা ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ। জাতির অন্তরে লুকিয়ে থাকা গভীর বেদনাকে উপলব্ধি করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। আর পেরেছেন বলেই তাঁর সরস মজলিসী গল্পে উচ্ছ্বসিত কৌতুকের আড়ালে জাতির গভীর ক্রন্দন ধ্বনিত হতে শোনা যায়। তাই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে দেশের মানুষের প্রতি বিদ্রূপ আছে ঠিকই কিন্তু বিদ্রূপই শেষ কথা হয়ে ওঠেনি, সেখানে বড় হয়ে উঠেছে অশ্রুর আভাষ। তাই তাঁর গল্পগুলি যতটা না SATIRE-ধর্মী তার থেকে অনেক বেশী

HUMOUR-ধর্মী। তাঁর এই নেপথ্যগামী অশ্রুধারার উৎস দেশ ও জাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাঁর গল্পগুলির সামগ্রিক আলোচনায় সে সত্যই পরিস্ফুট হয়েছে। দেশ ও জাতির কথা বলতে গিয়ে মানুষের মনোজগতের বিচিত্র রহস্যের সন্ধান দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেদিক থেকে তাঁর সাহিত্য কোন মহৎ সাহিত্যের আবেদন নিয়ে হাজির হয় না। কিন্তু দেশীয় সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন কুসংস্কারে ঘেরা বাঙ্গালীর জীবন, তাঁর গল্পে যেভাবে উঠে এসেছে তা আর কারো গল্পে পাওয়া যায় না। নাগরিক ভারতবর্ষের ছবি তাঁর গল্পে পাওয়া যায় না। তখন নগর সভ্যতা সেভাবে গড়েও উঠেনি। বরং তাঁর গল্পে গ্রামীন ভারতবর্ষের ছবি চিত্রিত হয়েছে। আর সেই গ্রামীন ভারতবর্ষের ছবি প্রদর্শন করতে গিয়ে গল্প-উপস্থাপন রীতিটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে ভারতবর্ষে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী। কথনের ক্ষেত্রে তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে রূপকথার ধরন ও মেজাজের ক্ষেত্রে তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে বৈঠকীয় মেজাজ।

বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পে ত্রৈলোক্যনাথের অল্প কিছু দিন পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজশেখর বসু। পরশুরাম হিসেবেই যিনি সব থেকে বেশী জনপ্রিয়। মানসিকতায় এবং জীবন যাপনে তিনি ছিলেন শহুরে। ত্রৈলোক্যনাথ যেমন জাতীয় জীবনে ঔপনিবেশিকতা প্রবেশের প্রাক্ মুহূর্তের ছবি এবং তাকে গ্রহণ করার প্রশ্নে ভারতবাসীর দ্বিধার মনোভাবকে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন পরশুরাম কিন্তু সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে এলেন। ভারতবাসী তখন ঔপনিবেশিকতা গ্রহণ করা নিয়ে আর আগের মত ততটা দ্বিধান্বিত নয়। বরং ভারতবাসীর জীবনে প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাব জাকিয়ে বসেছে। শুধু জাকিয়ে বসাই নয় অনেকক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক শিক্ষার কুপ্রভাব সমাজজীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আধুনিক ছলচাতুরীতে মানুষ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে রয়েছে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব। যথার্থ অর্থেই এ এক নতুন ভারতবর্ষ। পরশুরাম তাঁর গল্পে এদের ছবি তুলে ধরতে চাইলেন। দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষের ভিত্তি মূলে তীব্র আঘাত হেনেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাজ জীবনে নিয়ে এসেছে তীব্র অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা। এই সময় মানুষের লোভ সীমাহীন হয়ে উঠেছে। দিকে দিকে গজিয়ে উঠেছে কালোবাজারীর দল। রাজনৈতিক দিক থেকেও তখন চরম অস্থিরতা। সব মিলিয়ে এ যুগ সত্যিই বাঙ্গালীর চরম সংকটের যুগ, অনিশ্চয়তার যুগ। এ সংকট যতটা না গ্রামীণ তার থেকে অনেক বেশী শহরের। এরকম সময়ই তো ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনার জন্য আদর্শ। রাজশেখর বসু পরশুরামের ছদ্মবেশে যুগের এই চরম অস্থিরতাকে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে উপস্থাপন করলেন। হাস্যরস হল তার বাহন। আর হাতে তুলে নিলেন তিনি ব্যঙ্গের চাবুক। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় পরশুরাম নাগরিক মানুষের নানা অসঙ্গতিকে তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক মেরে আঘাত করলেন। তাই তাঁর গল্পের প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে স্যাটায়ার। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ারিষ্ট তিনি।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বনফুল ছদ্মনামে বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পে প্রকৃতই নতুন পথের দিশারী। মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের মানুষ তিনি। এই সময় ঔপনিবেশিক শিক্ষার তীব্র আলোড়ন সমাজ থেকে অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে। যা ছিল ভারতবাসীর কাছে নিন্দার বস্তু তা অনেকটাই সহনশীল হয়েছে। এই রকম সময়ে আবির্ভূত হয়ে বনফুল তাঁর গল্পে কৌতুকের আবহ নির্মাণ করেছেন ঠিকই কিন্তু সে কৌতুকে সমাজের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হয়নি। সমাজের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে ব্যক্তি মানুষের জীবনের নানা অসঙ্গতি। তিনি মানুষের জীবনের নানা অসঙ্গতিকে নিয়ে কৌতুক করেছেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনের গভীরতম সত্যের উপলব্ধি। দোষে গুণে ভরা মানুষ। এই মানুষের গুণের দিকটি উপস্থাপন করে তিনি যেমন সহজ কৌতুক করেছেন তেমনি তার দোষের দিকটি নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। সে বিদ্রূপে তীব্র বিষের জ্বালা নেই, আছে স্নেহমিশ্রিত তিরস্কার। মানুষের স্খলনে ও পতনে, তার আচার আচরণের মূঢ়তায় শিল্পী বনফুল নিজে যেমন হেসেছেন তেমনি গল্পের বিষয় হিসেবে স্নিগ্ধ কৌতুকের হাওয়ায় তাকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। যখন ডাক্তারের কাছে পুত্রের হুকওয়ার্ম হয়েছে জেনে বৃদ্ধ পিতা তাকে হুক্কা পিকর এ ব্যারাম হয়েছে বলে গালি দেয় তখন আমাদের হাসি পায় ঠিকই কিন্তু এই হাসি ক্রোধপ্রদীপ্ত বক্রহাসি নয়, এ হাসি স্নেহ মিশ্রিত HUMOUR-এর হাসি। কোথায় যেন মনে হয় দেশের অধিবাসী হিসেবে তার এই অজ্ঞতার দায় কিছুটা আমাদেরও। এভাবেই বনফুল তাঁর গল্পে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভবের স্তরে কৌতুকের সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে কৌতুককর সুবাসের বৈচিত্র্য এত বেশী যে তা অনুভব করে পাঠক মুগ্ধ না হয়ে পারে না। বাংলা ছোটগল্পে এত সূক্ষ্ম অনুভবের বৈচিত্র্যমন্ডিত গল্প বনফুল ছাড়া আর কেউ রচনা করতে পারেনি। এই বহু বৈচিত্র্যমন্ডিত কৌতুককর গল্প সৃষ্টির অন্তরালেই হাস্যরসিক বনফুলের জীবনদর্শনটি বিধৃত হয়ে রয়েছে। বনফুলের কৌতুককর গল্পগুলির আলোচনার নিরিখে তাঁর এই জীবনদর্শনটি এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করা হয়েছে।

'ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর ও বলাইচাঁদের হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা' শিরোনামাঙ্কিত অধ্যায়টি বর্তমান গবেষণা পত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন হাস্যরসিক শিল্পীর জীবন ও সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনাকালে বুঝে নিতে চেষ্টা করা হয়েছে শিল্পীত্রয়ীর সমসাময়িক যুগ স্বভাবকে। আর আলোচ্য অধ্যায়ে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই তিনজন শিল্পী তিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হওয়ার কারণে কীভাবে তাদের লেখক ব্যক্তিত্ব পরস্পরের থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে তার স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা করা হয়েছে । কৌতুকরসকে নিয়ে তিনজনই কারবার করেছেন কিন্তু সময়ের ভিন্নতা, যুগের দাবি তাঁদের শিল্পী সত্তাকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাবিত করেছে তাঁদের গল্পের বিষয় ও তাঁদের হাস্যরস সৃষ্টির ধরনকে। তাই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে যেখানে দেখা যায় ঔপনিবেশিকতা গ্রহণে

দ্বিধাগ্রস্থ এ দেশীয় মানুষ ও সমাজ সেখানে পরশুরাম একটু পরে আবির্ভূত হয়ে গল্পের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত এ দেশীয় সমাজ ও মানুষের নানা অসঙ্গতিকর ক্রিয়াকলাপ। স্বাভাবিকভাবেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে উঠে এসেছে গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রতিরূপ। অন্যদিকে পরশুরামের গল্পে পাওয়া যায় ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সদ্য নাগরিক সভ্যতার স্বাদ পাওয়া ভারতবর্ষের নতুন সমাজ ও মানুষকে। আর বনফুল যখন গল্প লিখতে এলেন তখন ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক শিক্ষা আর কোন সমস্যার আন্দোলন তোলে না। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বড় বড় সমস্যাগুলি তখন অনেকটাই মোলায়েম হয়ে এসেছে। তার বদলে সৃষ্টি হয়েছে হাজারো জীবন সমস্যা। বনফুল এই জীবন সমস্যাকেই তাঁর গল্পে চিত্রিত করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্পের বিষয় হয়েছে স্বতন্ত্র। তাই বলা যায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হওয়ার ফলে এই তিনজন লেখকের গল্পের বিষয় যেমন হয়েছে ভিন্ন তেমনি তাদের হাস্যরসের প্রকৃতিও গেছে পাল্টে।

সুতরাং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন হাস্যরসিক শিল্পীর হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে হাস্যরসিক উঠে আসে তাঁর সময়ের গর্ভ থেকেই। সময় লেখককে হাস্যরসিক হয়ে উঠতে প্রেরণা দেয়। হাস্যরসিক তার হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ করেন তাঁর নিজস্ব সময় থেকে। যে সময়ের সমাজ তিনি চোখে দেখেন, যে সময়ের সমাজে তিনি হাঁটাচলা করেন, যে সময়ের সমাজে তিনি মানসভ্রমণ করেন সেই সমাজ এবং তার অন্বিষ্ট মানুষ এবং তার আচরণই তো হাস্যরসিকের উদ্দিষ্ট। পাশাপাশি একথাও সত্য যে সময় এক জায়গায় থেমে থাকে না। সময়ের সচলতায় বদলে যায় মানুষ ও তার সমাজ এবং তাকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা। বদলে যায় মানুষের রুচিও। তাই হাস্যরসিকের বিষয় যেমন পরিবর্তিত হয় তেমনি তার অভিব্যক্তিতেও আসে বদল। তাই তিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হওয়া তিনজন হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের শিল্পী একই রসের রসিক হয়েও বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনরীতির দিক থেকে তারা হন ভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন। তাদের রচনার স্বাদও হয় আলাদা। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন হাস্যরসিক শিল্পীর ক্ষেত্রেও একথা সর্বাংশে সত্য। উপসংহার অংশে শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উক্ত তিন শিল্পীর একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।